



অধ্যায় ১৫

# পরিষেশ ও ভূমিকৃপ

এই অধ্যায় শেষে শিক্ষার্থীরা নিচের বিষয়গুলো সম্পর্কে জানতে পারবে—

- পরিবেশ
- পরিবেশের উপাদান
- ভূমিরূপ
- মাটি, পানি, বায়ু, জীবজগৎ ও ভূমিরূপ এর আন্তঃসম্পর্ক
- বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে প্রাকৃতিক বৈচিত্র্য

## পরিবেশ

পরিবেশ শব্দটি আমাদের কাছে খুব পরিচিত। কোনো স্থানের অবস্থা বোঝানোর জন্য আমরা সে স্থানের পরিবেশ কেমন তা বর্ণনা করি। সেখানে মনুষ্যসৃষ্টি কিংবা প্রাকৃতিক পরিবেশ দুটিই থাকতে পারে। সাধারণভাবে পরিবেশ বলতে আমাদের চারপাশে যেসব জৈব ও অজৈব উপাদান রয়েছে তার সবগুলোকে একত্রে বোঝানো হয়। পরিবেশের বিভিন্ন উপাদান মানুষ ও অন্যান্য জীবনকে নানাভাবে প্রভাবিত করে। আমরা যদি কোথাও থেকে বা কাজ করে স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করি, তখন আমরা বলি যে সেই জায়গার পরিবেশটা ভালো। কাজেই কোনো স্থানের পরিবেশ ভালো রাখতে হলে আমাদের সবার আগে পরিবেশের বিভিন্ন উপাদান সম্পর্কে জানতে হবে।

## পরিবেশের উপাদান

পরিবেশের প্রধান উপাদান হচ্ছে মাটি, পানি, বায়ু এবং জীবজগৎ। এর ভেতর প্রথম তিনটি উপাদান প্রাণহীন। এ জন্য মাটি, পানি এবং বায়ুকে পরিবেশের অজৈব (Abiotic) উপাদান বলা হয়। আর জীবিত সকল উদ্ভিদ, প্রাণী তথা সমগ্র জীবজগৎকে জৈব (Biotic) উপাদান বলে।

### মাটি

পৃথিবীর উপরের স্তরে (ভূত্বকে) যে নরম অংশ রয়েছে সেটিকে আমরা মাটি বলি। এই মাটি উদ্ভিদের বেঁচে থাকার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। যে মাটি যত উর্বর, সেই মাটিতে তত ভালো ফসল জন্মে। তবে মাটি তৈরি প্রক্রিয়া কিন্তু সহজ নয়। পাথর গুঁড়ে হয়ে সৃষ্টি খনিজ পদার্থ এবং জৈব পদার্থ মিশ্রিত হয়ে মাটি গঠিত হয়। মাটির খনিজ পদার্থগুলোকে সেগুলোর আকার অনুসারে তিনটি ভাগে ভাগ করা যায়। সেগুলো হলো বালি, পলি এবং কাদা। বালির কণাগুলো সবচেয়ে বড় বলে সেটা পানি ধরে রাখতে পারে না। আবার কাদামাটিতে কণাগুলো বেশি ছোট বলে এগুলোর



ফাঁকের ভেতর আটকে থাকা পানি উড়িদ সহজে গ্রহণ করতে পারে না। এই বালি, পলি এবং কাদার বিভিন্ন পরিমাণে মিশগের ফলে বিভিন্ন ধরনের মাটি দেখা যায়। যদি কোনো মাটিতে বালি, পলি এবং কাদার কোনোটিরই প্রাধান্য দেখা না যায়, তবে সোটিকে দোআঁশ মাটি বলে।

## মাটিদূষণ

মানুষের তৈরি বিভিন্ন ধরনের দূষণকারী পদার্থ মাটিদূষণের প্রধান কারণ। এসব দূষণকারী রাসায়নিক পদার্থ জৈব ও অজৈব উভয় ধরনের হতে পারে। বিভিন্ন ধরনের আবর্জনা সঠিকভাবে না ফেলে যেখানে-সেখানে ফেললে, কলকারখানা থেকে সৃষ্টি বিভিন্ন আবর্জনা এবং কৃষি জমিতে অনিয়ন্ত্রিতভাবে ব্যবহৃত সার এবং কীটনাশক মাটিদূষণ করে থাকে। মাটি দূষিত হলে তা বিভিন্ন জীব এবং মানুষের স্বাস্থ্যের জন্য হুমকি হতে পারে। মাটিদূষণ রোধ করতে হলে যেখানে সেখানে আবর্জনা ফেলা থেকে বিরত থাকতে হবে, এছাড়া কৃষিজমিতে সঠিক পরিমাণে এবং সঠিক পরিমাণে আবর্জনা এবং কীটনাশক ব্যবহার করতে হবে।

## পানি

পানির অপর নাম হচ্ছে জীবন। সমস্ত ধরনের প্রাণের বেঁচে থাকার জন্য পানি অপরিহার্য। পৃথিবীর মোট পানির খুব সামান্য অংশই মিঠা বা স্বাদু পানি। এই পানি পান করা এবং অন্যান্য দৈনন্দিন কাজে ব্যবহার করা যেতে পারে। মিঠা পানির অধিকাংশই রয়েছে বরফ আকারে আর খুব সামান্য অংশ রয়েছে নদ-নদী ও বায়ুমণ্ডলে। বায়ুতে অবস্থিত এই পানির পরিমাণকে আর্দ্রতা বলা হয়। তবে পরিমাণে সামান্য হলেও আবহাওয়ার বৈশিষ্ট্য নির্ধারণে বায়ুমণ্ডলে অবস্থান করা পানি বা জলীয় বাস্প অনেক গুরুত্বপূর্ণ। আবার নদ-নদী, খাল-বিল, হৃদ ইত্যাদিতে যে পানি থাকে, তা ভূমিরপের পরিবর্তনে বিশেষ ভূমিকা রাখে। তোমরা লক্ষ করলে দেখবে বর্ষাকালে বন্যার সময় মাটিতে পলির স্তর পড়ে। এই মাটি ফসল উৎপাদনের জন্য খুব গুরুত্বপূর্ণ। আবার অনেক এলাকায় বন্যার সময় নদীর পাড় ভেঙে অনেক ঘরবাড়ি, জমি পানিতে তলিয়ে যায়। ভূগর্ভস্থ পানি আমরা পাস্প বা টিউবয়েলের মাধ্যমে তুলে ব্যবহার করি। মাটির ফাঁকা স্থানের (Pore space) মধ্যে যে পানি থাকে, তা উড়িদ গ্রহণ করে বেঁচে থাকে। পরিবেশের উপাদান হিসেবে পানির গুরুত্ব বলে শেষ করা যাবে না।

## পানিদূষণ এবং তার প্রতিকার

পানি যখন বিভিন্ন পদার্থের মিশগে তার স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্য হারিয়ে জীবজগতের জন্য ক্ষতিকর হয়ে যায়, তখন তাকে আমরা দূষিত পানি বলতে পারি। মানুষের নানান কর্মকাণ্ডের ফলে পানি দূষিত হতে পারে। যেখানে সেখানে মলমুত্ত্ব ত্যাগ করলে, জলাশয়ে বা তার কাছাকাছি

আবর্জনা ফেললে, জমিতে দেওয়া সার ও

কীটনাশক পানিতে ধুয়ে জলাশয়ে পড়লে,

বিভিন্ন কলকারখানার আবর্জনা ও দূষিত পানি

নদীতে ফেললে পানি দূষিত হয়। এমনকি এর ফলে

ভূগর্ভস্থ পানিও দূষিত হতে পারে।

দূষিত পানি দৈনন্দিন কাজে ব্যবহার

করলে অথবা পান করলে নানা ধরনের



রোগব্যাধির আক্রমণে শারীরিক ও মানসিক ক্ষতি এমনকি মৃত্যুও ঘটতে পারে। এ জন্য পানিদূষণ রোধ করার জন্য যেখানে সেখানে ময়লা আবর্জনা ফেলা যাবে না। বৃষ্টির আশংকা থাকলে জমিতে সার, কীটনাশক এসব দেওয়া থেকে বিরত থাকতে হবে।

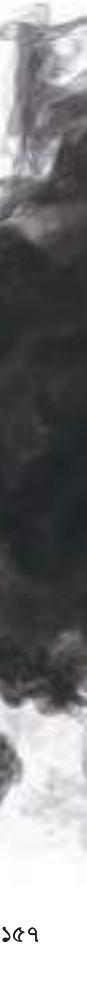
যেহেতু পৃথিবীর মোট পানির খুব সামান্য পরিমাণ হচ্ছে স্বাদু পানি, তাই পানি অপচয় করলে ভবিষ্যতে কঠিন সংকটের মুখে মানুষকে পড়তে হবে। বাগানে গাছের জন্য যতটুকু পানি দিতে হয় তার চেয়ে বেশি পানি দিলেই তা অপচয় হবে। আমরা অনেক সময় গোসল করার সময় পানির কল ঢালু রাখি; যার ফলে পানির প্রচুর অপচয় হয়। এসব আচরণে পরিবর্তন আনলেই পানির অপচয় রোধ করা সম্ভব।

## বায়ু

পরিবেশের একটি অন্যতম উপাদান হচ্ছে বায়ু। বায়ু বিভিন্ন গ্যাসের মিশ্রণের ফলে গঠিত হলেও শুকনো বায়ু প্রধানত নাইট্রোজেন (৭৮%) এবং অক্সিজেন (২১%) নিয়ে গঠিত। তবে আর্দ্রতার ভিন্নতার কারণে বায়ুতে ০ থেকে ৪ শতাংশ পর্যন্ত জলীয়বাষ্প থাকতে পারে। এ ছাড়াও বায়ুতে খুব কম পরিমাণে থাকে আর্গন, কার্বন ডাই-অক্সাইড, মিথেন, ওজোন, হাইড্রোজেন এবং অন্যান্য গ্যাস। বায়ুতে বিভিন্ন গ্যাসের পরিমাণ স্থান এবং সময় ভেদে পরিবর্তিত হতে পারে। জীবের বেঁচে থাকার জন্য প্রয়োজনীয় অক্সিজেন আমরা বায়ু থেকে পাই। আবার আমাদের নিঃশ্বাসের সময় নির্গত কার্বন ডাই-অক্সাইড উড়িদের খাদ্য তৈরিতে কাজে লাগে। এ ছাড়া পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের ওপরে ওজোন গ্যাসের একটি স্তর আছে যা পৃথিবীকে সূর্যের ক্ষতিকর অভিবেগনি রশ্মি থেকে রক্ষা করে। সূর্যের অভিবেগনি রশ্মি যে কোনো জীবের জন্য অত্যন্ত ক্ষতিকর।

## বায়ুদূষণ

মানুষের বিভিন্ন কর্মকাণ্ডের ফলে এবং বিভিন্ন প্রাকৃতিক কারণে বায়ুদূষণ ঘটে থাকে। তেল, গ্যাস, কাঠ প্রভৃতি পোড়ানোর ফলে বায়ুতে কার্বন ডাই-অক্সাইড এবং কার্বন মনোক্সাইড নির্গত হয়। কার্বন মনোক্সাইড একটি মারাত্মক বিষাক্ত গ্যাস এবং মানব দেহের ক্ষতি করে থাকে। বিভিন্ন বর্জ্য পদার্থ পচনের ফলে বায়ুতে মিথেন নির্গত হয়ে থাকে। মিথেন এবং কার্বন ডাই-অক্সাইড বায়ুর গড় তাপমাত্রা বৃদ্ধিতে প্রভাব ফেলে যা 'গ্রীন হাউস ইফেক্ট' নামে পরিচিত। জ্বালানি ঠিকমতো পোড়ানো না হলে তা থেকে কার্বন-মনোক্সাইডের মতো বিষাক্ত গ্যাস নির্গত হয়। এ ছাড়া আয়োসল স্প্রে, রেফিজারেটর ইত্যাদি থেকে ক্লোরোফ্রোরো কার্বন (সিএফসি) গ্যাস নির্গত হয় যা ওজোন গ্যাসের স্তর ক্ষয় করে ফেলে। ফলে সূর্যের ক্ষতিকর অভিবেগনি রশ্মি পৃথিবীতে প্রবেশ করে। এ ছাড়াও বায়ুদূষণের প্রাকৃতিক কারণের মধ্যে রয়েছে আগ্নেয়গিরির অগ্নৎপোত এবং বনের দাবানল। এই দুটি ঘটনার ফলে বায়ুতে প্রচুর পরিমাণে দূষিত গ্যাস, ছাইয়ের কণা ইত্যাদি নির্গত হয়।



বায়ুদূষণ রোধ করতে হলে প্রথমেই যে কাজটি করতে হবে তা হচ্ছে সঠিকভাবে জ্বালানির ব্যবহার। বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য প্রচুর পরিমাণে গ্যাস, তেল, কয়লা ইত্যাদি পোড়ানো হয়। ফলে বায়ুতে প্রচুর পরিমাণে দূষিত গ্যাস নির্গত হয়। বিদ্যুতের অপচয় না করে সঠিকভাবে ব্যবহার করলে বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য জীবাশ্ম জ্বালানির ব্যবহার করে আসবে যা বায়ুদূষণ রোধে সহায়ক হবে। সিএফসি নির্গত হয় এমন দ্রব্য তৈরি এবং ব্যবহার বন্ধ করতে হবে। ময়লা-আবর্জনা খোলা স্থানে পুড়িয়ে ফেলা বন্ধ করতে হবে। এ ছাড়া মাটিতে ঘাস ও গাছের আবরণ থাকলে বায়ুতে ধূলাবালির পরিমাণ কমে আসবে।

## জীবজগৎ



পৃথিবীর পরিবেশ প্রাণ ধারণের জন্য উপযুক্ত হওয়ায় এখানে নানা ধরনের উত্তিদ ও প্রাণীর বিকাশ ঘটেছে। প্রায় সাড়ে ৩০০ কোটি বছর ধরে পৃথিবীতে প্রাণের অস্তিত্ব রয়েছে। সমুদ্রের গভীরতম এলাকা থেকে বায়ুমণ্ডলের উচ্চতম স্থান, গভীর বন থেকে সুউচ্চ পর্বতের চূড়া পর্যন্ত জীবজগৎ বিস্তৃত। আকারের দিক থেকে দেখলে এককোষী ব্যাকটেরিয়া থেকে শুরু করে বিশাল আকারের নীল তিমি পর্যন্ত জীবজগতের অন্তর্গত। বায়ুতে নানান আণুবীক্ষণিক জীব রয়েছে। মাটিতে রয়েছে উত্তিদ, নানান পোকামাকড়, কেঁচো এবং আরও অনেক প্রাণী। পানিতে রয়েছে নানান জলজ প্রাণী ও উত্তিদ। পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের অক্সিজেনের বড় উৎস হলো সমুদ্রের খুদে ফাইটোপ্ল্যাক্টন ও শৈবাল। পৃথিবীর বিভিন্ন জীব বেঁচে থাকার জন্য পরিস্পরের সঙ্গে জড়িত। আবার উত্তিদ ও প্রাণীর নানান কর্মকাণ্ডের ফলে ভূমিরূপের পরিবর্তন হতে থাকে। উত্তিদ কোনো স্থানের আবহাওয়া ও জলবায়ু কে প্রভাবিত করতে পারে। যে সব স্থানে গাছপালা বেশি, সেখানে আবহাওয়া তুলনামূলকভাবে ঠান্ডা এবং বৃষ্টিপাত বেশি হয়ে থাকে।

## ভূমিরূপ

ভূমিরূপ বলতে কোনো স্থানের গঠনগত আকৃতি বোঝানো হয়। অর্থাৎ পৃথিবীব্যাপী অবস্থিত বিভিন্ন ভূমির উচ্চতা, আকৃতি, ঢাল, বন্ধুরতা, অবয়ব ইত্যাদিকে ভূমিরূপ বলা হয়। ভূমিরূপ গঠনে নানান প্রাকৃতিক প্রক্রিয়া রয়েছে যার মধ্যে অন্যতম হলো আগ্নেয়গিরির অগ্নুৎপাত, ভূমিকম্প, সূর্যরশ্মির প্রভাব, নদনদী, সমুদ্রসৌত, বায়ুপ্রবাহ, হিমবাহ ইত্যাদি। ভূমি রূপকে প্রধান তিনটি ভাগে ভাগ করা যায়; যেমন—পর্বত, মালভূমি ও সমভূমি।

যে সকল অঞ্চলে তীব্র ঠান্ডা অর্থাৎ সারা বছরই প্রায় বরফ পড়ে যেসব অঞ্চলে বরফের প্রবাহের মাধ্যমে ভূমিরূপ সৃষ্টি ও পরিবর্তিত হয়। একে হিমবাহ বলে। একে নদীর পানি প্রবাহের সঙ্গে তুলনা করা যায়। তবে নদীর পানির চেয়ে অনেক আস্তে হিমবাহের বরফ প্রবাহিত হয়।

উষণ ও শুষ্ক অঞ্চলে বায়ুপ্রবাহের ফলে ভূমিরূপ পরিবর্তন হয়। যেমন মরুভূমিতে বায়ুপ্রবাহের ফলে নানান আকার ও আকৃতির বালিয়াড়ি দেখা যায়। বায়ুপ্রবাহের ফলে কোনো স্থান থেকে ধূলা ও বালি অন্য স্থানে স্থানান্তরিত হলে আগের স্থান নিচু হয়ে যেতে পারে। আবার যেখানে সেই বায়ুপ্রবাহের ফলে

স্থানান্তরিত বালু জমা হয় সেখানে বালিয়াড়ির মতো ভূমিরূপ দেখা যায়।

তবে বাংলাদেশের মতো নদীপ্রধান দেশে প্রধানত নদীর পানির প্রবাহের ফলে বিভিন্ন ধরনের ভূমিরূপ দেখা যায়। এসব দেশে বন্যার সময় নদীর পানির সঙ্গে বয়ে আসা পলিমাটি জমা হয়ে উর্বর সমতল ভূমি তৈরি হয়ে থাকে। যখন নদী ভূমির উপর দিয়ে প্রবাহিত হয়ে সমুদ্রে পড়ে, তখন সেখানে নদীর পানিতে বয়ে আসা নানান আকারের মাটির কণা (বালু, কাদা ইত্যাদি) জমা হয়ে চর এবং দ্বীপের সৃষ্টি হয়।

## মাটি, পানি, বায়ু, জীবজগৎ ও ভূমিরূপের আন্তঃমশ্রে

মাটি, পানি, বায়ু এবং জীবজগৎ এগুলো প্রত্যেকটি একটি অন্যটির সঙ্গে সম্পর্কিত। পরিবেশের এই চারটি উপাদানই পৃথিবীর ভূমিরূপ সৃষ্টি ও পরিবর্তনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। যেকোনো স্থানের ভূমিরূপ তৈরি তিনটি প্রধান প্রক্রিয়া কাজ করে।

১. ক্ষয় কার্য (Erosion),
২. স্থানান্তর (Transportation),
৩. অবক্ষেপণ (Deposition)।

ভূমিরূপ গঠনে মাধ্যম হিসেবে পানি এবং বায়ু কাজ করে থাকে। এ ক্ষেত্রে তরল পানি এবং বরফ উভয়ই ভূমিরূপ পরিবর্তনে ভূমিকা রাখে। যেকোনো স্থানের পাথর, মাটি, বালু প্রভৃতি পানি, বায়ু বা বরফের দ্বারা ক্ষয় হলে, সেখানে বিভিন্ন ধরনের ভূমিরূপ সৃষ্টি হয়। আবার যখন এসব ক্ষয় হওয়া পাথর ও মাটি যখন অন্য কোথাও জমা হয় তখন সেখানেও নানা ধরনের ভূমিরূপ সৃষ্টি হয়। আমরা আগে দেখেছি যে পাথর চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে মাটিতে পরিণত হয়। যে সকল পাথর কঠিন, সেগুলো সহজে ক্ষয় হয় না। আবার যেসব পাথর তুলনামূলকভাবে নরম, সেসব এলাকায় ক্ষয়জনিত ভূমিরূপ বেশি দেখা যায়। বন্যার সময় অনেক নদীতে পাড় ভাঙে এবং নদীর পাড় খাড়া হয়ে থাকে। এটি ক্ষয়জনিত কারণে সৃষ্টি ভূমিরূপ। আবার শীতকালে বা শুকনো মৌসুমে নদীতে চর পড়তে দেখা যায়। এগুলো অবক্ষেপণজনিত কারণে সৃষ্টি ভূমিরূপ। বিভিন্ন প্রাণী মাটিতে গর্ত করে বসবাস করে। এসব গর্ত মাটির ক্ষয়কে ত্বরান্বিত করে। অপরদিকে মাটির উপরে উত্তিদের আবরণ সেই স্থানের মাটির ক্ষয় হওয়া রোধ করে।



## বাংলাদেশের ভূমিকণ

বাংলাদেশ পৃথিবীর বৃহত্তম ব-দ্বীপ। এ দেশের ওপর দিয়ে পদ্মা-মেঘনা-যমুনার মতো বড় নদী ছাড়াও আরও শত শত ছোট নদী প্রবাহিত হয়েছে। বন্যার সময় এসব নদীর বাহিত পলি বাংলাদেশের প্রায় তিন-চতুর্থাংশ এলাকায় সঞ্চিত হয়ে বিস্তীর্ণ সমতলভূমি সৃষ্টি হয়েছে, এই সমতলভূমির গড় উচ্চতা সমুদ্র সমতল থেকে ১০ মিটারের কম। সমুদ্র সমতল থেকে খুব বেশি উঁচু না হওয়ায় প্রতি বছর প্রবল মৌসুমি বর্ষণের ফলে দেশের অধিকাংশ এলাকা প্লাবিত হয়।। আধুনিক দৃষ্টিকোণ থেকে বাংলাদেশের ভূ-প্রকৃতিকে সুস্পষ্ট তিনটি ভাগে ভাগ করা যায়, যথা: (ক) পার্বত্য অঞ্চল খ) সোপান অঞ্চল এবং (গ) প্লাবন সমভূমি।

(ক) পার্বত্য অঞ্চল: রাঙামাটি, বান্দরবান, খাগড়াছড়ি, চট্টগ্রাম, সিলেট, মৌলভীবাজার ও হবিগঞ্জ জেলার পাহাড়ি এলাকাগুলো নিয়ে এ অঞ্চল গঠিত। এই অঞ্চলের গড় উচ্চতা প্রায় ৬০০ মিটার। প্রায় ২.৫ কোটি বছর আগে হিমালয় পর্বত উত্থিত হওয়ার সময় এসব পর্বতের সৃষ্টি হয়েছিল।

(খ) সোপান অঞ্চল: অনুমান করা হয় প্রায় ২৫ লক্ষ বছর আগে আন্তঃবরফগলা পানিতে প্লাবনের সৃষ্টি হয়ে এসব চতুরভূমি সৃষ্টি হয়েছিল। এগুলোকে বরেন্দ্রভূমি, মধুপুর ও ভাওয়ালের গড় এবং লালমাই পাহাড় এই তিনটি এলাকায় ভাগ করা হয়। সমুদ্র সমতল থেকে এই অঞ্চলের গড় উচ্চতা ১৫ মিটার।

(গ) প্লাবন সমভূমিঃ পার্বত্য এবং সোপান অঞ্চল ছাড়া সমগ্র বাংলাদেশের প্রায় ৮০% ভূমি নদীবিধোত এবং বিস্তীর্ণ সমভূমি নিয়ে গঠিত। এই ভূমিসমূহ গত ২০ লক্ষ বছরে ধীরে ধীরে সৃষ্টি হয়েছে। বছরের পর বছর বন্যার সঙ্গে পরিবাহিত মাটি সঞ্চিত হয়ে এ প্লাবন সমভূমি গঠিত হয়েছে। এখানে মাটির স্তর খুবই গভীর এবং খুবই উর্বর।

## বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে প্রাকৃতিক ধৈর্য

কোনো স্থানের বৈশিষ্ট্য সেখানকার বিভিন্ন রকম প্রাকৃতিক উপাদান যেমন—ভূসংস্থান, জলবায়ু নদী-নালা, বন, পাহাড়-পর্বত, জীববৈচিত্র ইত্যাদির সমন্বয়ে তৈরি হয়। প্রকৃতি এবং তার মাঝে বসবাসকারী উদ্ভিদ ও প্রাণী কোনো একটি নির্দিষ্ট স্থানের প্রাকৃতিক পরিবেশ তৈরি করে। কোনো একটি স্থানে প্রাকৃতিক পরিবেশে যেসব বৈশিষ্ট্য লক্ষ করা যায় তা ওই এলাকার প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য। যেমন—সিলেটের প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য হচ্ছে ছোট-বড় বিভিন্ন আকারের পাহাড় ও টিলা, এবং সেখানে প্রচুর বৃষ্টিপাত হয়। সুন্দরবনে বিভিন্ন উদ্ভিদের শাসমূল থাকে এবং প্রতিদিন দুইবার করে জোয়ারের পানিতে গাছের শাসমূলগুলো নিমজ্জিত হয়। বরেন্দ্রভূমির মাটিগুলো লাল রংয়ের হয়ে থাকে। এসবই সেসব এলাকার প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য। কোনো একটি নির্দিষ্ট স্থানের প্রাকৃতিক পরিবেশ সেই স্থানের ভূসংস্থান এবং জলবায়ুর উপর নির্ভর করে।

বাংলাদেশের মোট ক্ষেত্রফল প্রায় ১,৪৮,৪৬০ বর্গ কিলোমিটার। আয়তনে ক্ষুদ্র হলেও বাংলাদেশের প্রাকৃতিক বৈচিত্রের কমতি নেই। নদীবিধৌত বাংলাদেশ পৃথিবীর সবচাইতে বড় ব-দ্বীপ এবং তা নানান রকম প্রাকৃতিক বৈচিত্র ভরপুর। ভূসংস্থান বা ভূমিরূপের ওপর ভিত্তি করে বাংলাদেশকে কয়েকটি অঞ্চলে ভাগ করা যায়। এসব অঞ্চলের পরিবেশের উপাদান, উদ্ভিদ, প্রাণী সবকিছুই বিশেষ বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। এসব অঞ্চলের মধ্যে রয়েছে অসংখ্য নদ-নদী, দক্ষিণের বঙ্গোপসাগর, সিলেট ময়মনসিংহ এলাকার হাওর ও জলাভূমি। স্থলভূমির বড় অংশ জুড়ে রয়েছে পদ্মা মেঘনা যমুনা বিধৌত প্লাবনভূমি, বরেন্দ্রভূমি, মধুপুর ও ভাওয়ালের গড়ের সোপান ভূমি, চট্টগ্রাম, পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকার পাহাড়সমূহ, সমুদ্র উপকূলীয় এলাকার ম্যানগ্রোভ বনভূমি সুন্দরবন, প্রবাল দ্বীপ সেন্ট মার্টিন ইত্যাদি। এইসব বৈশিষ্ট্যপূর্ণ এলাকার কয়েকটা নিচে আলোচনা করা হলো।



## মুন্দরবন

যেসব বৃক্ষ এবং গুল্ম উপকূলীয় জোয়ার-ভাটাপ্রবণ এলাকায় পাওয়া যায়, সেগুলোর সমষ্টি হচ্ছে ম্যানগ্রোভ বন। ইউনেস্কো বিশ্ব ঐতিহ্যবাহী স্থান হিসেবে স্বীকৃতি পাওয়া সমুদ্র উপকূলবর্তী নোনা পরিবেশের সবচেয়ে বড় ম্যানগ্রোভ বন হিসেবে সুন্দরবন বিশ্বের সর্ববৃহৎ অখণ্ড বনভূমি। প্রায় ১০ হাজার বর্গকিলোমিটার জুড়ে গড়ে ওঠা সুন্দরবনের ষাট ভাগই রয়েছে বাংলাদেশে, বাকি অংশ রয়েছে ভারতে। সুন্দরবনকে জালের মতো জড়িয়ে রয়েছে অসংখ্য নদী, কাদা চর এবং ম্যানগ্রোভ বনভূমির লবণাক্ততাসহ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দ্বীপ। এই বনে সবচেয়ে বেশি পাওয়া গাছের প্রজাতি হলো সুন্দরী এবং গেওয়া। অসংখ্য পাখি, মাছ, স্তন্যপায়ী প্রাণী, সরীসৃপ এবং উভচর প্রজাতি সহ প্রায় ৫০০ বন্যপ্রাণীর বাসস্থান হচ্ছে সুন্দরবন। শুধু মাছ এবং গাছ নয়, প্রতিবছর সুন্দরবন থেকে মৌয়ালরা প্রাচুর পরিমাণ মধু সংগ্রহ করে।



## নদী

বাংলাদেশ একটি নদীমাতৃক দেশ। অসংখ্য ছোট-বড় নদ-নদী বাংলাদেশের উপর দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে এবং পরে দেশের দক্ষিণে বঙ্গোপসাগরে পড়েছে। এসব নদীবাহিত পলি, বালু ইত্যাদি জমা হয়ে বঙ্গোপসাগরে অনেক দ্বীপ সৃষ্টি হয়েছে এবং এখনও হচ্ছে। এসবই বাংলাদেশের প্রাকৃতিক বৈচিত্রের অংশ। প্রধান নদ-নদী ছাড়াও নদীগুলোকে সেগুলোর গঠন অনুযায়ী শাখানদী কিংবা উপনদী নামে অভিহিত করা যায়।

যেমন, যেসব নদী অন্য কোনো নদী থেকে উৎপন্ন হয় তাকে শাখানদী বলে। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, ধলেশ্বরী যমুনার প্রধান শাখানদী। এ ছাড়া মধুমতী, মাথাভাঙা, কপোতাক্ষ নদ, পশুর নদ, বেতনা নদী ইত্যাদি পদ্মার শাখানদী।

আবার যেসব নদী কোনো একটি উৎস থেকে উৎপন্ন হয়ে কিছু দূরত্ব অতিক্রম করে অপর একটি নদীতে পতিত হয় বা সংযুক্ত হয় তাকে সেই নদীর উপনদী বলে। বাংলাদেশে তিঙ্গা, ধরলা, করতোয়া, আত্রাই, সুবর্ণশ্রী ইত্যাদি নদী উৎসস্থল থেকে প্রবাহিত হয়ে যমুনা নদীতে গিয়ে মিশেছে; তাই এরা যমুনা নদীর উপনদী।

এদেশে শাখা-প্রশাখাসহ প্রায় ২৩০টি নদ-নদী সারা বছর বিপুল জলরাশি নিয়ে ২৪,১৪০ কিলোমিটার জায়গা দখল করে দেশের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে। বাংলাদেশের অধিকাংশ এলাকাই শত শত নদীর মাধ্যমে বয়ে আসা পলিমাটি জমে তৈরি হয়েছে। এই নদ-নদীগুলো বাংলাদেশের মানুষের জীবনযাত্রার একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ, অসংখ্য মানুষ নদী তীরে বসবাস করে, কৃষিতে সেচে নদীর পানি ব্যবহৃত হয়, জেলেরা মাছ ধরে জীবনযাপন করে। আমাদের দেশের মানুষের যোগাযোগের জন্য নিয়মিতভাবে নৌকা, লপ্ত এবং জাহাজে যাতায়াত করে। তোমরা শুনে খুশি হবে দেশের জন্য অপরিসীম গুরুত্বের কথা বিবেচনা করে নদীকে এই দেশে জীবন্ত মানুষের সমান অধিকার ও মর্যাদা দেওয়া হয়েছে।

## সমুদ্র

বাংলাদেশের একমাত্র সমুদ্র বঙ্গোপসাগর। বঙ্গোপসাগর একটি উপসাগর কারণ, এর তিন দিক ভূমি দ্বারা বেষ্টিত। বাংলাদেশের জলবায়ুর ওপর বঙ্গোপসাগরের প্রভাব অপরিসীম। আমরা বৃষ্টির সময় আকাশ থেকে যে পানি ঝরতে দেখি, সেই পানির উৎস হচ্ছে কোনো সাগর বা মহাসাগর। বাংলাদেশের ক্ষেত্রে বর্ষাকালে বঙ্গোপসাগর থেকে আসা জলীয়বাস্পপূর্ণ মৌসুমি বায়ুর প্রভাবে প্রচুর বৃষ্টিপাত হয়। সে সময় বাংলাদেশের দক্ষিণ পশ্চিম দিক থেকে মৌসুমি বায়ু প্রবাহিত হয়।

জোয়ার এবং ভাটার মধ্যবর্তী পানির উচ্চতার তারতম্যের জন্য সমুদ্র উপকূলবর্তী অঞ্চলের নদীগুলোতে জোয়ারের সময় বড় নৌযান প্রবেশ করতে পারে। খুলনার মোংলা বন্দরে যেসব জাহাজ আসে তা মূলত বঙ্গোপসাগর থেকে জোয়ারের সময় নদীতে প্রবেশ করে থাকে। সমুদ্র উপকূলের বিপুলসংখ্যক জেলে সমুদ্রে মাছ ধরেন যেগুলো আমাদের দেশের মাছের প্রয়োজন মিটিয়ে থাকে। সমুদ্রের নিচে গ্যাস এবং তেলের বিশাল সঞ্চয় আছে বলে অনুমান করা হয় এবং সমুদ্রতীরের শহরগুলো এই দেশের মানুষের পর্যটনকেন্দ্র হিসেবে গড়ে উঠতে শুরু করেছে।

## হাওর

মৌসুমি বায়ুর আগমনের সময়ে বৃষ্টিপাতের কারণে বাংলাদেশের প্লাবন ভূমির একটি বিশাল অংশ চার থেকে ছয় মাসের জন্য পানির নিচে তলিয়ে যায়। এরূপ জলাভূমির মধ্যে রয়েছে হাওর, বাঁওড়, বিল ইত্যাদি।

হাওর হচ্ছে পিরিচ আকৃতির ভূ-গাঠনিক অবনমন অর্থাৎ নিচু এলাকা। বর্ষাকালে হাওরগুলোতে প্রচুর পানি থাকে, তবে শীতকালে পানির পরিমাণ অনেক সংকুচিত হয়ে যায়। বাংলাদেশের বৃহত্তর সিলেট এবং ময়মনসিংহ অঞ্চলে হাওর দেখতে পাওয়া যায়। এ হাওরগুলো মূলত নদী এবং খালের মাধ্যমে পানির প্রবাহ পেয়ে থাকে। শীতকালে হাওরগুলো বিশাল, দিগন্তবিস্তৃত শ্যামল প্রান্তরের রূপ নেয়, আবার বর্ষাকালে কুল-কিনারাবিহীন সমুদ্রের মতো রূপ ধারণ করে। বর্ষাকালে ৬ মিটার পর্যন্ত গভীর বন্যার পানিতে তলিয়ে থাকে এই অঞ্চল। শুষ্ক মৌসুমে অধিকাংশ পানি সরে যায়। তখন দুই একটি বিলের অগভীর পানিতে প্রচুর পরিমাণে বৈচিত্র্যময় জলজ উদ্ভিদ গজিয়ে ওঠে। চর জেগে সেখানে হোগলা, নলখাগড়ার ঝোপ গজিয়ে ওঠে। এর ফলে একদিকে মাছ ও অন্যান্য জলজ প্রাণীর খাদ্য ও আশ্রয়ের আদর্শ স্থান হয়ে ওঠে হাওর অঞ্চলগুলি, অন্যদিকে পরিণত হয়েছে পরিযায়ী পাখিদের আকর্ষণীয় আবাসস্থলে।

## প্রবাল দ্বীপ

বাংলাদেশের একেবারে দক্ষিণে বঙ্গোপসাগরে অবস্থিত সেন্ট মার্টিন একটি প্রবাল দ্বীপ। প্রবাল বা কোরাল (Coral) হচ্ছে এক ধরনের সামুদ্রিক কীট, যার মৃতদেহ জমা হয়ে বিভিন্ন আকার ধারণ করে। এসব সামুদ্রিক কোরালের মৃতদেহ জমা হয়ে প্রবালদ্বীপ গঠিত হয়। সেন্ট মার্টিন দ্বীপের চারপাশে সমুদ্রের পানিতে নানা প্রজাতির মাছ, জেলিফিশ এবং কচ্ছপ দেখা যায়।

### অনুশীলনী ?

- ১। বাংলাদেশের ভূ-প্রকৃতিকে যে তিনটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে তা তো জেনেছে, তোমার এলাকা কোন ভাগে পড়ে?
- ২। তোমার এলাকায় সবচেয়ে পরিচিত বন্য প্রাণী কারা? পরিবেশের কোন বৈশিষ্ট্যের জন্য তারা এই এলাকা বেছে নিয়েছে?

